# তাবেদারদের এত গত্রদাহ ও অস্হিরতা কেন?(১ম খন্ড)

## চীনের সাথে বাংলাদেশের জোট বন্ধনের এখনই উপযুক্ত সময়

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিজ কন্ডালিৎসা রাইসের সাম্প্রতিক বাংলাদেশ(পুরো সার্ক অঞ্চলের) বিষয়ে ভারত কে সাথে নিয়ে কাজ করার তার ও তার দেশের আগ্রহ প্রকাশ নিয়ে আমি মোটেও অবাক হইনি। কারণ আমেরিকা স্রেফ ১৯৭১ সালের আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া কখনই ভারতের বিরুদ্ধে অবস্হান নেয় নি। সেই ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধেও মার্কিনিরা পাকিস্তান কে অস্ত্র-রসদ সরবারাহ করা বন্ধ করে দেয়। ফলে পাকিস্তান কে চীনের দ্বারস্হ হতে হয়। কারণ আমি আগেও বলেছি ভারত হচেছ একটা বিশাল বাজার এবং মার্কিনিদের দীর্ঘদিন ধৈর্য্য ধরার ফলে আজকে ভারতের বাজার তাদের দখলে এবং তার দখল পাকাপোক্ত করতে তারা বদ্ধপরিকর। যার আরও উদাহরণ সাম্প্রতিক জনাব বুশের পাকিস্তানের নিকট এফ-১৬ জঙ্গী বিমান বিক্রির সিদ্ধান্তে মার্কিন প্রশাসনও তাদের দেশের লকহীড কোম্পানী কতৃক অদূর ভবিষ্যতে ভারতের জন্য পরবর্তী প্রজন্মের অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমান সরবারাহে তারা কোন বাধা দিবে না। তো আমরা মিজ রাইসের সাম্প্রতিক মন্তব্যে উদ্বিগ্ন। আমারা মার্কিনিদের ভারতের স্বার্থ রক্ষা করতে যেয়ে বাংলাদেশের উপর অযৌক্তিক, স্বার্থ ক্ষুণ্ন বা বিকিয়ে ক্ষতি করে এমন কোন সিদ্ধান্ত মেনে নিব না। আমি আশা করি যে মার্কিনিরা বাংলাদেশের উদ্বেগের কথা বুঝবে।

ভারত যা আমি মনে করি তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের গায়ে পড়ে গন্ডগোল পাকানো পানিতে থেকে কুমিরের সাথে লড়াই করার মত। সে জন্যেই আমি চাই পৃথিবীর সকল দেশের সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থ-বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পর্ক হবে মিউচুয়াল বেনিফিটের অনুযায়ী যা কিনা আমাদের পররাষ্ট্র নীতিতে আছে সবার সাথে বন্ধুত্ব এবং কারো সাথে শত্রূতা নয়। আমি বিশ্বাস করি আমরা বাংলাদেশীরা শান্তিপ্রিয় জাতি। কিন্তু কেউ যদি আমাদের সাথে গায়ে পড়ে শত্রূতা করে আমারা তাহলে চুপচাপ বসে থাকব কেন? অবশ্যই আমাদের দেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব, অর্থনীতি, ব্যাবসা-বাণিজ্য, ন্যায্য স্বার্থ, সুখ-শান্তি তথা দেশের সার্বিক স্হিতীশীলতার বিরুদ্ধে কোন বহিঃশক্তির অন্যায় আবদার, ধমক ও শত্রূতা আমরা কখনও বরদাশত করব না। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব ব্যাবস্হায় ভারতের নিকট সূবর্ণ সুযোগ এসে গেছে যে অন্তত পাকিস্তান ছাড়া সার্কের বাকী সব দেশের উপর নিজস্ব আধিপত্য বজায় রাখতে। কারণ মধ্য এশিয়ার তেল-গ্যাস, আফগানিস্তান সহ বিভিন্ন বিষয়ে মার্কিনিদের পাকিস্তান কে পক্ষে রাখা অত্যন্ত জরূরী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেজন্যই ভারতের পক্ষে কোনভাবেই পাকিস্তানের উপর ছড়ি ঘুরানো সম্ভব নয়। কিন্তু আমেরিকার কাছে বাংলাদেশের কোন গুরূত্ব না থাকার কারণে ভারতের পক্ষে আধিপত্য বিস্তারে ভারত মড়িয়া। কেনই বা হবে না ভারত তো কখনই ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ কে মেনে নেয়নি। ভারত ও ভারতীয়(অধিকাংশ হিন্দুরা) ঐ বিভাগ কে তাদের ভারত মাতার অঙ্গচেছদ বলে মনে করে। তাদের তথাকথিত ভারত মাতার অঙ্গচেছদের একটি অংশ ৫৬০০০ বর্গমাইল হচেছ বর্তমান বাংলাদেশের এলাকা। ১৯৪৭ এর পরবর্তী পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিভিন্ন বৈষম্য, শোষণ-অত্যাচারের জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান নিজেদের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এদেশের জনগণ ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। মুক্তিযুদ্ধে যেখানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধারা ও অন্যান্য নিহত শহীদেরা প্রাণের ও নির্যাতনের বিনিময়ে দেশ কে স্বাধীন করার জন্য ব্যাকুল তখন ভারত কেবল তার সদূর প্রসারী স্বার্থের জন্য তথা পাকিস্তান ভাঙা এবং একে উপনিবেশিক-তাবেদার রাষ্ট্রের লক্ষ্যে তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করে। কেননা ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ এর পূর্ব পর্যন্ত শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও অন্যান্যদের কে বলতেন যে তার দেশ ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র, গোলা-বারূদ, ট্রেনিং এমনকি যুদ্ধবিমান এবং যুদ্ধের ক্ষতিগ্রস্হ শরণার্থীদের আশ্রয় ও সর্বাত্নক সহযোগিতা

দিবে কিন্তু ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও তার দেশের কোন লোক কে যুদ্ধ করতে দিবেন না। পরবর্তীতে জনাব জগজিৎ সিং আরোরা বাংলাদেশে এসে বলেন যে ভারত পাকিস্তান ভাঙার সুযোগ গ্রহণ করেছে মাত্র। তারপরেও কথায় বলে Morning Shows The Day, বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর ভারতের প্রভূত্ব আচরণ তথা ফারাক্কা বাঁধ, তালপট্টি দ্বীপ, বেরুবাড়ী, অসম ২৫ বছরের সামিরিক চুক্তি, স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি ইত্যাদি বহু বিষয়ে কিছু সংখ্যক ভারতীয় দালাল তাবেদার ছাড়া পুরো দেশবাসীর নিকট ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরূদ্ধে সোচচার হয়। কিন্তু তাবেদাররা তথা আওয়ামিলীগার ও বাকশালীরা ভারতের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের মুখোশ রক্ষা করতে সর্বদা সচেষ্ট। ১৯৭১ এর যুদ্ধ চলাকালে আওয়ামিলীগ নেতা চিত্ত রনজন সুতার ইন্দিরা গান্ধীকে প্রস্তাব দেন যে তিনি যেন বাংলাদেশ কে দখল করে ভরাতের অঙ্গরাজ্য বা নতুন প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্হিতি এবং তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ঘটার আশংকায় ইন্দিরা গান্ধী তা নাকচ করে দেন। ১৯৭২-৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ছিল সম্পূর্ণ দিল্লি-মস্কো ভিত্তিক। স্রেফ বাংলাদেশের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধূ ভারতের প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে ও.আই.সি সম্মেলনে যোগ দেন। আমাদের দূর্ভাগ্য যে ছয় দফার কোথাও ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র না থাকলেও ভারতীয় প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ডঃ কামাল ভারত হতে যে সংবিধানের খসড়া আনেন বঙ্গবন্ধূ তা অনুমোদন করেন। এই জাম্বুরা মাথাওয়ালা আসলে দুইমুখা সাপ। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে সে যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যেমন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের তাবেদারী করেন ঠিক তেমনি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান যখন বঙ্গবন্ধূ কে মুক্তিদেয় বঙ্গবন্ধূকেও সে বশ করে ফেলে। সে জন্যেই তো ১৯৭২-৭৫ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম হতে ইকরা বিসমে্ রাব্বিকাল লাজী খালাক কথা, শহীদুল্লাহ্-সলিমুল্লাহ্ হল সমূহ থেকে মুসলিম এবং কবি নজরুল ইসলাম কলেজ থেকে ইসলাম শব্দ বাদ্ দেওয়া দিয়ে তারা ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে উগ্র নাস্তিকতা ছড়িয়ে দেয় এবং খাঁটি বাঙালিত্বের নামে পৌত্তলিক সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার প্রাণন্তকর চেষ্টা চলে। অথচ ১৯৪৭ সালের আগে এ অঞ্চলের মুসলমানেরা যারা ছিল অধিকাংশই কৃষক তারা ঈদের দিনেও জমিতে কাজ করতে বাধ্য হত এবং তাদের নিয়োগকর্তা সাম্প্রদায়িক হিন্দু জমিদারেরা শুধু তাদের দূর্গা-কালি পুজায় ছুটি দিত। আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামিলীগার, কমুউনিষ্ট বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শিক্ষকেরা রবীন্দ্র বন্দনায় মশগুল। অথচ রবীন্দ্র-শরৎ চন্দ্র সহ কোন হিন্দু সাহিত্যিকরা তো বটেই কোন হিন্দুই ব্রিটিশ আমলে বাঙালী মুসলমানদের বাঙালী বলত না শুধু মুসলমান বা মোচলমান বা নেড়ে বলত। দুঃখের বিষয় এই যে যখন পুর্ব বঙ্গের মুসলমানদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর সহ অনেক হিন্দুই এর প্রতিষ্ঠার প্রবল বিরোধিতা করেন এবং বলেন চাষা-ভূষারা কি শিখবে। যদি এমন হত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত জীবিত থাকতেন তাহলে কি তিনি ১৯৪৭ এর পূর্ব পাকিস্তান এবং ১৯৭১ এ স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব মেনে নিতেন? না কোন দিনও না। তিনি অখন্ড ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। অথচ দূর্ভাগ্যের বিষয় তারই লিখা গান আমাদের জাতীয় সংগীত। যে গান তিনি ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের বিরূদ্ধে অখন্ড বাংলার পক্ষে লিখেছিলেন এবং যেখানে বাংলাদেশ নামক শব্দ অনুপস্হিত। তো এমন অসম্পূর্ণ জাতীয় সংগীত স্রেফ ভারতীয়দের খূশী করার জন্যই আওয়ামিলীগাররা নির্বাচন করে। ৭২-৭৫ সময়ে এদেশের ৯০% জনগণ মুসলমান তা ঢেকে রাখার প্রাণন্তকর চেষ্টা করা হয়। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৭৫ এর ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও গণঅভ্যূথ্যানের মাধ্যমে শহীদ জিয়াউর রহমান ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিবর্তে দেশের ৯০% জনগণের ইচছার প্রতিফলন সংবিধানে ঘটান। আমি অনেক আওয়ামিলীগের সাধারণ সমর্থকের সাথে আলাপ করেছি তারাও বলেছেন যে অন্তত এ কাজ টি জিয়াউর রহমান ভালো করেছেন। আমি বলি তিনিই বাংলাদেশের প্রথম সফল রাষ্ট্র নায়ক। ১৯৭২-৭৫ সালে স্বাধীন দেশ হয়েও বাংলাদেশের কর্ম তৎপরতা ছিল অত্যন্ত মলিন। এমন কি আজকে বাংলাদেশের জন্য গুরূত্ব পূর্ণ রাষ্ট্র চীন ও সৌদি আরবও বাংলাদেশ কে ১৯৭৬ সালের আগ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয় নি। কারণ বাংলাদেশ সম্পূর্ণ তখন ভারতের কথায় উঠত বসত। আর দিল্লী-মস্কো অক্ষশক্তিতে ভিড়ার জন্য আমাদের কে মার্কিন শ্যেন দৃষ্টিতে পড়তে হয়। পরিণাম

বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে করুণ মৃত্যু। তিনি মস্কো-দিল্লি ব্লকে ভিড়লেও তার বিশ্বস্ত অনুচর-ডানহাত ক্ষন্দকার মূশতাক ঠিকই গোপনে গোপনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে হাত মেলান। ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট হতে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার ২৮ জনের ২৩ জনই ক্ষন্দকার মূশতাকের সরকারে যোগদেন এবং তাদের সরকার ঐ বছরের ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত টিকে। উক্ত তিন মাস ভারত ক্ষন্দকার মূশতাক সরকারের সাথে উপরে উপরে ভাব দেখালেও গোপনে তার গোয়েন্দা সংস্হা RAW ঠিকই তাদের বিশ্বস্ত লোকেদের মাধ্যমে সামরিক ক্যু এর মাধ্যমে আমেরিকান পন্হী মূশতাক সরকার কে হটিয়ে নিজেদের তাবেদার প্রতিষ্ঠা করার চক্রান্ত শুরু করে দেয়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের প্রথম সামরিক ক্যু ঐ ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ এ সংঘটিত হয়। ঐ দিন থেকে জেনারেল খালেদ মোশারফ যে কিনা আসলে ভারতের পাপেট, ক্ষমতা দখল করা মাত্র ভারতীয় অল-ইন্ডিয়া রেডিও এবং আকাশবাণী প্রশংসায় পঞ্চমূখ এবং তাদের প্রকৃত মিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকে। কিন্তু দেশপ্রেমিক বাংলাদেশী সেনাবাহিনী ও জনতার ১৯৭৫ এর ৭ ই নভেম্বর বিপ্লব ভারতের তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠার চক্রান্ত ব্যার্থ করে দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে একমাত্র ভারত ছাড়া জেনারেল খালেদ মোশারফের ক্ষমতা গ্রহণ পৃথিবীর কোন দেশই স্বাগত জানায় নি। ভারত যতই মড়িয়া হৌক না কেন খালেদ মোশারফ ও তার কিছু সংখ্যক সহযোগীরা ছিল সম্পূর্ণ রূপে গণ বিচিছন্ন সরকার। ফলে সিপাহী-জনতার হাতে তাদের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতা লাভের পর সারা বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাতন্ত্রতা উজ্জল হয়। কেনান ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রবাসী মুজিব নগর সরকার কে বাগে পেয়ে তারা নিম্নলিখিত শর্তসমূহ চুক্তি করতে বাধ্য করে;

(১) মূক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে সকল মূক্তিবাহিনী(বাঙালী সামরিক সদস্য সহ) ভারতীয় কমান্ডের অধীনে থাকবে।
(২) স্বাধীন বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্হান কতদিন তা অনির্দিষ্ট।
(৩) স্বাধীন বাংলাদেশে কোন নিজস্ব সামরিক বাহিনী(নৌ, স্হল, বিমান) থাকবে না।
(৪) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে মিলিশিয়া ও প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে যাদের কে কেবল ভারতীয় সামরিক বাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
(৫) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অবাধ সীমান্ত বাণিজ্য চলবে।
(৬) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি এমন সকল সরকারী(সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী বাঙালী আমলারা) কর্মচারীদের বরখাস্ত করে দিয়ে তদস্হলে ভারতীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা শূন্য স্হান পূর্ণ করা হবে।
(৭) বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নের সময় সম্পূর্ণ ভাবে অবশ্যই ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ নেওয়া হবে।

তো এই হল ভারতের আসল মতলব। মনে রাখতে হবে ১৯৪৪ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা ও বৃটেন ফ্রান্স কে মূক্ত করে কিন্তু এমন অসম-অযৌক্তিক এবং তার সার্বভৌত্ব বিরোধী বা অপমান জনক কোন চুক্তিই ফ্রান্সের উপর চাপিয়ে দেয় নি। পক্ষান্তরে পোল্যান্ড, চেকশ্লোভাকিয়া সহ ইত্যাদি দেশসমূহ যারা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জার্মান নাৎসী বাহিনীর আগ্রাসন দ্বারা দখল হয়েছিল তাদরে কে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পূর্ণ অসম-অযৌক্তিক এবং তার সার্বভৌত্ব বিরোধী বা অপমান জনক চুক্তি করে তথাকথিত পোলিশ রাজধানী ভিত্তিক সমাজতন্ত্রিক ওয়ারশ জোট গঠন করে(পরবর্তীতে গ্রীস ও তুরস্ক ছাড়া সকল পূর্ব ইউরোপ এই জোটে আসে)। যেহেতু সকল রসুনের গোড়া একখানে তাই দিল্লীও স্বাধীন বাংলাদেশ কে বাগে পেয়ে এমন সূবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি। কিন্তু বিধি বাম ১৯৯০ এ সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ গোটা পূর্ব ইউরোপের মার্ক্স-লেলিন পন্হী সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ রূপে ও চরম ভাবে পতন হয়। আজকে পূর্ব ইউরোপের পোল্যান্ড, চেক, হাঙ্গেরী, রোমানিয়া তো বটেই ইউক্রেন, জর্জিয়া, আজারবাইজান, কিরঘিজস্তান সহ সিআইএস এর সকল রাষ্ট্রই বর্তমান রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রভাব বলয়ের বাইরে চলে যাচেছ। একদা ১৯৬২(অক্টোবর) সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন চক্রান্তের মাধ্যমে কিউবায় পরমাণূ

ক্ষেপনাস্ত্র মোতায়েনের মাধ্যমে আমেরিকার উপর মনস্তাত্তিক চাপের গেম আজীবন খেলার চেষ্টা করেছিল যা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বর্তমানে পূর্ব ইউরোপের প্রায় সকল দেশ(ইতিমধ্যে পোল্যান্ড ন্যাটোর সদস্য) এবং সিআইএস দেশ সমূহে স্হায়ী ভাবে মার্কিন ঘাটি গড়ে উঠছে। ফলে বর্তমান রাশিয়ার অনির্দিষ্ট কালের জন্য তার ঘুম প্রায় হারাম হয়ে যাবে। আসল ফ্যাক্ট হল উল্লেখিত দেশ সমূহের ও তাদের জনগণের সোভিয়েত বা রাশিয়ার সাথে তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তারা স্হায়ী ভাবে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য মার্কিনিদের দ্বারস্হ হয়েছে। সেই হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের কাছে(গুটিকয়েক আওয়ামিলীগার-বাকশালী ছাড়া) ভারতও তীব্র তিক্ততার বিষয়। ভারত বাংলাদেশের কেমন মিত্র তা পানি, ব্যাবসা বাণিজ্য, শান্তিবাহিনী-বঙ্গভুমি আন্দোলন, আধুনা আওয়ামিলীগের মতন বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচার বা প্রোপাগান্ডা সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিমাতা সুলভ আচরণ দ্বারা অনুভুত হয়। অনেকে বলেন ভারত হিন্দু ধর্মাবলম্বী অধূষ্যিত রাষ্ট্র বলে বা যা মূল কারণ কিন্তু লক্ষ্য করূন সাংবিধানিক ভাবে হিন্দু রাষ্ট্র নেপালের জনগণ ভারতের আচরণ বা জলূমে এতটাই অতিষ্ঠ যে তাদের দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন খেলাধুলায় ভারতের সাথে অন্য দলের খেলায় বিপক্ষ দল যেমন বাংলাদেশ তো বটেই এমনকি তারা পাকিস্তান কে পর্যন্ত সমর্থন করে। তাহলে পাঠকগণ বুঝুন যে একটা দেশ আরেক টা প্রতিবেশী দেশ দ্বারা কতটুকুন বৈরীতার শিকার হলে এধরণের আচরণ করে। আর এ কারণেই ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর মস্কো-দিল্লী পন্হী আওয়ামিলীগার ও বাকশালীদের চরম ভাবে পতন ঘটে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আওয়ামিলীগার ও বাকশালীদের এখন বর্তমান প্রভু হচ্ছে দিল্লী আর সে কারণেই তারা এখন তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মুখোশ এটে দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টির মাধ্যমে কুটিল ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতায় যাওয়ার নীল নকশা করছে। এমনকি তাদের এই ভন্ড চেতনার রক্ষায় তারা ভারত কে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার জন্য আহবান যানাচেছ। এর থেকে আসল সত্য বেরিয়ে আসে যে তারা তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি(আওয়ামিলীগার-বাকশালীরা) প্রকৃত পক্ষে গণবিচিছন্ন ও গণধিকৃত শক্তি নতুবা তারা যদি সত্যিই দেশের ১৪/১৫ কোটি মানুষের পক্ষের শক্তি হবে বা তাদের যদি আস্হা ও সমর্থন থাকবে তবে তারা কেন ভারত কে একটি স্বাধীন স্বার্বভৌম দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বলবে?

কিন্তু র্দূভাগ্য বাংলাদেশের যে একশ্রেণীর শিক্ষিত এলিট পার্সন তথা বুদ্ধিজীবি যেমন আগা চৌধুরী, মুনতাসির মামুন, কবির চৌধুরী, আলী যাকের, মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ওহাদুিল হক এরা সবাই নিজেদের বিবেক ও দেশপ্রেম আদর্শ বিসর্জন দিয়ে আওয়ামিলীগার-বাকশালী তথা ভারত তোষণ নীতি তাবেদারী কে তাদের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে। জনকন্ঠ, সাপ্তাহিক ২০০০ এরাও বিরতিহীন ভাবে সমান তালে আওয়ামিলীগার-বাকশালীদের পক্ষে তাদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছে। এ সকল তাবেদারজীবি ও পত্র পত্রিকার ভাবখানা এমন যে ১২০০ মাইল দূর থেকে ভারত কে টপকে পাকিস্তান বাংলাদেশ কে দখল করে পুনরায় পাকিস্তান বানাবে। বড়ই বলিহারী ও গাঁজাখুরী বুদ্ধি সেই সকল আঁতেল দের। কাক যেমন চোখ বন্ধ করে কিছু লূকায় এবং বেকুব ও পাগলেরা যেমন সবাই কে তাদের মতন মনে করে ঠিক সেই রকম এই সকল কূলাঙ্গার রামছাগল তাবেদারজীবিরাও বাংলাদেশের সমগ্র জনগণ কে তাদের মতাদর্শের মতন মনে করে। এ দেশের মানুষ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করেছে দিল্লীর তাবেদারী করার জন্য নয়।

কিছুদিন আগে এ বছরের মার্চ মাসে পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব মেজর (অবঃ) হাফিজ যখন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে ভারত এ বছর বাংলাদেশ কে চুক্তি অনুযায়ী ন্যায্য পরিমাণ পানির চেয়ে অনেক অনেক কম পানি দিচেছ। তিনি আরও বলেন যে ১৯৯৭-২০০১ সাল পর্যন্ত এবং তাদের সময় ২০০২-০৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ গড়ে ১২-১৫ হাজার কিউসেক পানি(শুষ্ক মৌসুমে) পেয়েছে। মন্ত্রী মহোদয় পানি চুক্তির অসারতা সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন। বিভিন্ন মিডিয়ায় ও পত্র পত্রিকায় যখন এ সব বক্তব্য প্রকাশিত হয় ব্যাস আর যায় কৈ দালাল আব্দুর

রাজ্জাক(শেখ হাসিনার পানিসম্পদ মন্ত্রী) বর্তমান মন্ত্রীকে এক হাত নেন যে ১৯৯৭ থেকে এখন অবধি ২০০৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ নাকি গড়ে ৩৫ হাজার বা তার বেশী পানি পেয়ে আসছে। আর মন্ত্রী নাকি ৩০ বছরের চুক্তির বিরূদ্ধে প্রতিহিংসাবসত বিষেদগার করছেন। এখানে কিছু প্রশ্ন যদি ১৯৯৬ সালে পৌনে ৭ মিটার গভীরতায়(হার্ডিনজ্ ব্রিজ পয়েন্টে) ২৭০০০ কিউসেক পানি প্রবাহিত হয় তবে ১৯৯৭ সালে পৌনে ৬ মিটার গভীরতায় কিভাবে ৩৫০০০ কিউসেক পানি আসে? ১৯৯৯ সাল হতে ২০০১ পর্যন্ত আর কখনই পানি উজান হতে পদ্মায় প্রবাহ নিয়ে আব্দুর রাজ্জাক আর কখনই সাংবাদিক সম্মেলন করেন নি। শুধু তাই নয় উক্ত সময়(১৯৯৮-২০০১) তার মন্ত্রণালয় কঠোর ভাবে পদ্মায় পানি প্রবাহের তথ্য ও উপাত্ত গোপন রাখত এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সাংবাদিকগণ বহু চেষ্টা করেও সরকারী ভাবে সূনির্দিষ্ট তথ্য উপাত্ত পায়নি। এই সময়টুকুন তারা শুধূ হার্ডিনজ ব্রিজের নিকট পানি প্রবাহ দেখে বিভিন্ন বেসরকারী বিশেষজ্ঞ দ্বারা মোটামুটি আনুমানিক পানি প্রবাহ দেশবাসীর কাছে তুলে ধরত। পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মূখ্যমন্ত্রী জনাব জ্যোতি বসূ পর্যন্ত বলেছিলেন যে বাংলাদেশ ৩০ বছর গঙ্গা-পদ্মা চুক্তির দ্বারা লাভবান হবে না। কিন্তু বিচিত্র সেলুকাস দালাল মন্ত্রী রাজ্জাক সারাদেশের মানুষের কাছে ও বিশ্বের কাছে ঢোল পিটিয়ে বেড়ান যে তাদের সরকার একটি সফলতম চুক্তি করেছে এবং বাংলাদেশ নাকি ন্যায্যর (৩৫০০০ কিউসেক)চেয়ে বেশী পরিমাণ পানি পাচেছ। পক্ষান্তরে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারও এ নিয়ে খুব বেশী তথ্য সরবারাহ করেনি। আর করেই বা লাভ কি তাদের তাবেদাররা তাদের কোন বক্তব্য তো বাকি রাখেইনি বরং গোয়েবেলসীয় কায়দায় হাজার টা মিথ্যা কথা বলে তাদের গুণগাণ ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ করেছে। সেজন্যেই তো কথায় বলে প্রভু ভারত যত না বলে তার তাবেদার আওয়ামিলীগার-বাকশালীরা বলে হাজারগুণ। আজকে ভারতের টিপাইমুখী এবং উচচ ভিলাষী ব্রম্মপুত্র-গঙ্গা আন্তঃ নদী সংযোগ প্রকল্প নিয়ে শেখ হাসিনা, আ রাজ্জাক বা তার দলের অন্যান্য নেতাদের কোন উদ্বিগ্ন হওয়াতো বহুদুর এমনকি তারা এ বিষয়ে ২/১ টা কথাও বলেন না তো বটেই এমন কি জাতিসংঘে বা অন্যান্য কোন দেশ বা সংস্হায় ভারতের কোন অনৈতিক আচরণের বিরূদ্ধে অভিযোগ করলে তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন। তাদের একটাই কথা যে জোট সরকার বাংলাদেশ কে পাকিস্তান-বাগিস্তান. তালেবান, মৌলবাদী রাষ্ট্র ও ব্যার্থ-অকার্যকর রাষ্ট্র বানাচেছ। নদীমাতৃক বাংলাদেশে ফারাক্কার কু-প্রভাবে দেশের বরেন্দ্র ও বদ্বীপ অঞ্চল মরূকরণ এবং লবণাক্ততা-আর্সেনিক বেড়ে চলছে এ নিয়ে তাদের কোনই মাথা ব্যাথা নেই। কারণ শেখ হাসিনা বলে দিয়েছেন যে (যদিও ভারত শুকনো মৌসুমে ফরাক্কা দিয়ে চুক্তি অনূযায়ী পানি দিত না) মাটি নাকি পানি শুষে নেয়।

১৯৯৬-২০০১ সালে ক্ষমতায় থাকা কালে শেখ হাসিনা বলতেন যে তারা সরকারে আসার আগের পূর্ববর্তী সরকার গুলো(১৯৭৬ সাল হতে) ভারতের সেভেন সিষ্টার্স রাজ্য সমূহের স্বাধীনতাকামী গেরিলাদের জন্য বাংলাদেশে বহু ট্রেনিং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেছিল। তার সরকার সেই সকল ক্যাম্প বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ আমরা কোন বাংলাদেশী সংবাদপত্রে এমনকি আওয়ামী পন্হী পত্রিকাতেও দেখিনি যে হাসিনার সরকার বাংলাদেশের ঠিক কোন কোন জায়গায় এ সকল ক্যাম্প সমূহ বন্ধ করে দেয়। অথচ ভারতের মদদপুষ্ট শান্তিবাহিনী, বঙ্গভূমিরা যে ভারতে ক্যাম্প সহ অস্ত্র, গোলা-বারূদ, প্রশিক্ষণ পায় সেটা নিয়ে শেখ হাসিনা বা অন্যান্য আওয়ামিলীগার নেতা ও বুদ্ধিজীবিরা কোন প্রতিবাদ করে নি। বরং ভারতের হাতে পায়ে ধরে শান্তিবাহিনীর প্রধান দেশ দ্রোহী সন্তু লারমার সাথে তথাকথিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। এই কালো চুক্তিতে তিন টি ধারা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর প্রচন্ড হুমকি স্বরূপ এগুলো হল (১) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নতুন বাঙালীরা বসতি স্হাপন তো দূর যারা বহু বছর ধরে(এমনকি শত বছরের) অত্র অঞ্চলে সেটেল্ড আছে তারা তাদের বসতি গুটিয়ে নিবে, (২) বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে এবং (৩) অত্র অঞ্চলে তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রশাসন থাকবে। এই সন্তু লারমা হচেছ গোলাম আজমের চেয়েও বহুগুণ বড় রাষ্ট্রদোহী এবং বাংলাদেশের অখন্ডতার সুস্পষ্ট হুমকি। অথচ এই স. লা হচেছ আওয়ামিলীগার ও ভারতের প্রিয় ব্যাক্তি।

বর্তমানে জোট সরকার ভারতের সাথে মায়ানমার-বাংলাদেশ-ভারত গ্যাস পাইপ লাইন বিষয়ে দরকষাকষি করছে এবং যাতে বাংলাদেশের স্বার্থে কয়েক টি সুবিধা আদায়ের চেষ্টায় আছে তখন আওয়ামিলীগার, বাকশালী ও তাদের অনুগত তথাকথিত স্বাধীনতা স্বপক্ষের শক্তি কোন উচচ বাচ্য করে না। আবার ইদানিং ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ বিনা উস্কানিতে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে নিরীহ বাংলাদেশী জনগণ ও বিডিআর হত্যা করে। আবার ফসল গবাদি পশূ লুটপাট সহ চোরাচালান, ফেন্সীডিল পাচার, ভারতীয় ডাকাত ও দূস্কৃতিকারীদের বাংলাদেশর সীমান্তের অভ্যন্তরে জনপদ সমূহে অপরাধ সংঘটনে সাহায্য করে। এই এপ্রিলের মাঝামাঝি ব্রাম্মণবাড়িয়ার আখাউড়া সীমান্তে বিএসএফ সম্পূর্ণ অবৈধ অনুপ্রবেশ করে নিরীহ গ্রামবাসীদের প্রহার নির্যান্তন করতে থাকলে বিডিআর যখন এগিয়ে যায় তখন অসভ্য বর্বর বিএসএফ, বিডিআর জাওয়ানদের প্রতি কোন কারণ ছাড়াই গুলি বর্ষণ করে কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বিডিআর সম্পূর্ণ আত্নরক্ষার্থে পাল্টাগুলি চালালে দুজন বিএসএফ সদস্য নিহত ও বাকীরা কুকুরের মত লেজগুটিয়ে পিছু হটে তাদের দেশে পালায়। এই ঘটনায় বিএসএফ একজন নিরীহ বাংলাদেশী কিশোরী কে গুলি করে হত্যা করে। এরপরে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় দিল্লীতে নিযুক্ত বাংলাদেশী হাইকমিশনার কে ডেকে তীব্র প্রতিবাদ করে এবং বাংলাদেশের ভারতীয় হাই কমিশন অফিসও নিন্দা জানায়। ভারতীয় অসভ্য বর্বরতা ও তাদের ভাবখানা এমন যে চুরি আবার শিনাজুড়ি। কিন্তু বাংলাদেশের পরম দূর্ভাগ্য যে আওয়ামিলীগাররা সাবের হোসেন চৌধুরী ও ফারূক চৌধুরী(সাবেক পররাষ্ট্র সচিব) সাংবাদিক সম্মেলেন করে বাংলাদেশী কিশোরীরর হত্যাকান্ড ও বিএসএফ এর আগ্রাসী তৎপরতার নিন্দা জানানো তো দূর বরং জোট সরকার কে নিন্দার বন্যায় ভাসিয়ে দেয়, এই যে জোট সরকার নাকি প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে ব্যার্থ হয়েছে। কুলাঙ্গার রামছাগল আর কাকে বলে? যে অসভ্য বর্বর ভারতীয় বাহিনী সীমানার ওপার থেকে তো বটেই বরং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হত্যাকান্ড সহ আগ্রাসী তৎপরতা করে তার কোন সমালোচনা তো নেই বরং স্বাধীন চেতা জোট সরকারের নিন্দা করে যা কিনা প্রকারান্তরে ভারতীয় অপরাধ কে ষোল আনা যায়েজ করে। আর এরাই হল তথাকথিত স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি। ধিক্কার তাদের প্রতি। দেশের মানুষ কে বিভক্ত করা এবং ভারতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং ১২০০ মাইল দুরের পাকিস্তানী জুজুর ভয় দেখানো। কিন্তু তাদের এই গাঁজাখুড়ী বক্তব্য বাংলাদেশর ৬০% জনগণ তো বটেই তাদের সচেতন সমর্থকরাও বিশ্বাস করে না। আওয়ামিলীগার, বাকশালী, তাবেদারজীবিরা নদীর পানি, অসম বৈষম্য পূর্ণ ব্যাবসা-বাণিজ্য, শান্তি বাহিনী, বঙ্গভুমি, তালপট্টি দ্বীপ, ছিটমহল সহ হাজারো বিষয়ে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ভারতের বিরূদ্ধে টু শব্দ করে না খালি একটাই কথা যে বর্তমান জোট সরকার বাংলাদেশ কে নব্য পাকিস্তান বানাচেছ এবং এর বিরূদ্ধে সরাসরি ভারতীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন(ইতিমধ্যে আ. জলিল আহবান করেছেন)। যারা জেগে জেগে ঘুমায় তাদের কোন দিন ঘুম ভাঙানো যায় না সে জন্যেই তো তাদের বানের মতো দেশে বিদেশে বাংলাদেশের বিরূদ্ধে প্রোপাগান্ডা ও ষড়যন্ত্র এবং ভারতের দালালী করার পরও ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশের ৯০% জনগণই পাকিস্তান কে সমর্থন করে। ফলশ্রূতিতে কিছু আওয়ামিলীগার বুদ্ধিজীবিরা তাদের মতাদর্শের পত্রিকা সমূহে এ নিয়ে প্রচন্ড উষ্মা প্রকাশ করে। এ থেকে পরিস্কার ভারতীয় ব্যার্থতা এবং পাকিস্তানের সফলতায় এদেশের ৯০% জনগণের সন্তুষ্টিতে তাদের প্রচন্ড গত্রদাহ হয়। আর এ থেকে একটা সত্যই বেড়িয়ে আসে যে তাদের মতাদর্শ আসলে একটা গণ বিচিছন্ন মতাদর্শ যা এমন কি তাদের সাধারণ সচেতন সমর্থকগণও একমত নন। তারা তো দেশে জোট সরকারের বিরূদ্ধে কোন জনসমর্থন তো পান না তাই আন্তজার্তিক বিভিন্ন ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি সমূহের কাছে গিয়ে জোট সরকারের বিরূদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করেন এবং একে বিশ্বজনমত গঠনের প্রক্রিয়া বলে আখ্যায়িত করেন। দেশের জনগণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিশেষ বিশেষ আন্তজার্তিক মহলে বাংলাদেশের বিরূদ্ধে কুৎসা রটায়। অর্থাৎ নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ।

বর্তমানে তারা জামাত সহ বিভিন্ন ইসলাম সংশ্লিষ্ট রানৈতিক দলের ব্যাবসা-বাণিজ্যের আশাতীত সাফল্যে আওয়ামিলীগার, বাকশালী ও তাদের তাবেদারজীবিরা বড্ড গত্রদাহ ও অস্হিরতার শিকার বা প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে ছাড়খার। এখন তারা যেন তাদের এই সফলতা সহ তাদের ব্যাবসা বাণিজ্যের পতন ঘটাতে বদ্ধপরিকর। কেন এই সকল তাবেদারদের স্মরণ নাই যে আশির দশকে ইসলামী ব্যাংক সহ অন্যান্য ইসলামি গোষ্ঠীর ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান শুরুর প্রাক্কালে তারা যেমন কবি শামসুর রহমান, কবির চৌধুরী ইত্যাদিরা প্রবল বিরোধীতা করে এবং বলে যে এরা লিল্লাহ্ যাকাতের তথা রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির গ্রহণ কারক বা ভিক্ষার টাকায় চলে দেশ ও জনগণের বারোটা বাজাবে। শুধু তাই নয় এই সকল ইসলাম বিদ্বেষী তাবেদারজীবিরা বিদেশে গিয়ে এই সমস্ত বাংলাদেশী ইসলামী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিরূদ্ধে কুৎসা রটায় ফলে এলসি বা অন্যকোন বৈদেশিক লেনদেনে প্রথম ৩/৪ বছর ইসলামি প্রতিষ্ঠান সমূহ কে যথেষ্ঠ বেগ পেতে হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন আন্তজার্তিক ব্যাংক ও বাণিজ্যিক সংস্হা সরাসরি ইসলামী ব্যাংকের লেনদেনের প্রক্রিয়া সরাসরি প্রত্যাখান করে। কিন্তু পরবর্তীতে ধীরে ধীরে অবস্হার উন্নতি ঘটে এখন এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে বাংলাদেশের সরকারী ব্যাংক বাদে বেসরকারী ব্যাংকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈদেশিক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংককেই সবচেয়ে বেশী গুরত্ব দেয়। তাদের দীর্ঘদিনের মেধা-নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম, সততার দ্বারাই তারা আজকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছেছে। কিন্তু ইসলামী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমুহের মেধা, সততা নিষ্ঠার কোন মূল্যায়ন তো নেই বরং তাদের বিরূদ্ধে প্রতিহিংসা স্বরূপ নতুন ধরণের প্রোপাগান্ডা ও ষড়যন্ত্র শুরূ হয়েছে। তারা তাবেদারজীবিরা যতই ষড়যন্ত্র করূক ইসলামী ব্যাংক সহ অন্যান্য ইসলামী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহ আন্তজার্তিক অঙ্গনে যে সুনাম অর্জন করেছে তা সংশ্লিষ্ট ইসলামী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বা অন্যকোন কর্মচারী ছাড়া আর কারো পক্ষেই তাদের দূর্নাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আর আওয়ামিলীগাররা এবং তাবেদারজীবিরা তাদের দলের কেউ যেমন ডাঃ ইকবালের(সাবেক সংসদ সদস্য ঢাকা-১০) প্রিমিয়ার ব্যাংকের শেয়ার জালিয়াতির ঘটনা নিয়ে কোন সমালোচনা করছে না। তাদের একটাই অস্হিরতা যে যেভাবেই হৌক সকল ইসলামি বাণিজ্যিক সংস্হা কে যেনতেন ভাবে এমনকি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হলেও তাদের ব্যাবসার পতন ঘটানো তা না হলে বাংলাদেশ মৌলবাদী বা তালেবানী হয়ে যাবে। কারণ তাদের সিংহভাগই তো দেশের ৯০% মুসলমান কে ইসলামি আদর্শ হুকুম আহকাম ও ভাল আখলাকের মানুষ হওয়ার সমন্ধে প্রচারাণা ও সচেতনতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যায় তা তাদের তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও খাঁটি বাঙালিত্ব অর্জনের জন্য দারূণ অন্তরায়। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রিক ভন্ডামি এদেশের জনগণের উপর জোর পূর্বক চাপিয়ে দিতে চায় এবং ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ কে অস্বীকার করে। কিন্তু দেশের ৯০% জনগণের নিজস্ব ধর্মের সমন্ধে যথাযথ ধারণা ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রিক ধারণা সমূহ কে নাকচ করে দেয়, সেই সাথে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ স্বীকার করা সহ ১৯৭১ সালের স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতি তাদের সম্পূর্ণ আনুগত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ। এদেশের আজকে স্বাধীন সার্বভৌম হয়ে টিকে থাকার অবদান ৯০% মুসলমান জনগণের সবচেয়ে বেশী। আর যেহেতু আওয়ামিলীগের তাবেদারজীবিরা(যেমন কবির চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক জাতীয়) কোন কালেও ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগ তো স্বীকার করেনই না বরং এখনও বলেন যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপের উচিত ভারতের সাথে অঙ্গীভূত হওয়া। তাদের মতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও স্বার্বভৌমত্বের কোন প্রয়োজন নেই। বরং নিখিল ভারতের সাথে মিশেই এদেশের জনগণ শান্তি পাবে। তারা পাকিস্তান, চীন ও মার্কিন পণ্য বর্জন করে কেবল মাত্র ভারতীয় পণ্য ক্রয় করার কথা বলেন। কিন্তু এতদিন এগুলো বিষয়ে তারা খুব একটা মুখ খুলত না কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ সচেতন ও স্বাধীনচেতা হয়ে উঠার কারণে আজকে তাদের গত্রদাহ ও অস্হিরতা বেড়ে গেছে। আজকে যদি ওয়ার্ল্ডভিশন সহ বিভিন্ন মিশনারী এনজিও বা প্রতিষ্ঠান যদি খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার বা যারা খ্রীষ্টান আছেন তাদের কে আরও ধার্মিক হওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যাবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ফান্ড কালেক্ট করতে পারে তো ইসলামি ব্যাংক সহ অন্যান্য শান্তিপূর্ণ ইসলামি এনজিওরা কেন ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রচারণা করতে পারবে না? ভারতের দিকে তাকালে দেখা

যায় যে শিবসেনা, বজরং, আরএসএস সহ বিভিন্ন চরম উগ্রপন্হী হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন সমূহ কে তাদের দেশের বড় বড় বাণিজ্যক সংস্হা যেমন টাটা, বিরলা, রিলায়েন্স সহ বিভিন্ন বৃহৎ কোম্পানী প্রচুর অর্থ দান করে থাকে। ভারতের বাণিজ্যিক নগরী মুম্বাই এর সিংহভাগ ব্যাবসা তো বটেই ভারতের শেয়ার বাজারের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে শিবসেনা সংগঠনের লোকেরা। যার বদৌলতে তারা হিন্দু ধর্মের প্রচারের নামে মুসলমান, খ্রীষ্টান সহ বিভিন্ন ধর্মের লোকেদের জোরপূর্বক হিন্দু বানাতে চেষ্টার ত্রূটি করেনা। আর ব্রাম্মণবাদীদের উগ্রবাদী নীতি ভারতের সংখ্যালুঘু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য আশংকা ও যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ। কিন্তু সারা পৃথিবীতে এখন মুসলমানদের ধর্মীয় সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য শিক্ষার জন্য অর্থের বিভিন্ন উৎস ও তহবিল কে ঢালাওভাবে সন্ত্রাসীর অপবাদ দেওয়া হচেছ। কিন্তু প্রতিবেশীদেশ ভারতের অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ভাঙন, গুজরাটের মুসলিম নিধন সহ সংখ্যালুঘু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বৈষম্য মূলক ও বর্বর আচরণ নিয়ে তেমন কোন উচচ বাচ্য নেই। ২০০৩ সালে ষ্টার টিভি নেটওয়ার্কে একটি পাবলিক মতামতের অনুষ্ঠান যা রাস্তার ও বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন পেশার মানুষের মনোভাব জানতে চাওয়া হয়েছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত বাবরি মসজিদের জায়গায় কি করা যেতে পারে। ঐ সময়টাতে আদালতে বাবরি মসজিদ মামলায় সেখানে যে মসজিদ নির্মাণের পূর্বে রাম মন্দির ছিল কিনা তা নিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদদের নমুনা সংগ্রহ বা প্রমাণ হাজিরের ব্যাপারটি ছিল সারা ভারতে তুঙ্গে। যাই হৌক অনুষ্ঠানে যে গুটিকয়েক মুসলমান সাক্ষাৎকার দিয়েছিল তারা বেশীরভাগই বলল যে যেহেতু তখন পর্যন্ত রামমন্দিরের কোন অস্তিত্ব, নিদর্শন বা চিহ্ন এমনকি কোন প্রকার ধারণাই পাওয়া যায়নি সেহেতু ভারত সরকারের উচিত সেখানে পুনরায় মসজিদ নির্মাণ করে দেওয়া। তবুও তাদের ২/১ জন বলল যে কোর্ট যদি প্রমাণ পায় যে সেখানে মন্দির ছিল বা কোর্টের রায়ে মন্দির নির্মাণের নির্দেশ তারা মেনে নিবে। বাদবাকী অধিকাংশ যারা হিন্দু ধর্মের লোক ছিল তাদের মধ্যে একেক জনের একেক মতদিয়ে বলল সরকারের এগুলোর একটি করা উচিত যথা (১)মন্দির-মসজিদ একসাথে নির্মাণ করা হৌক, (২)লাইব্রেরী হোক, (৩)হাসপাতাল, (৪) গবেষণাগার, (৫) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্তম্ভ নির্মাণ ইত্যাদি। আর বাদবাকী কিছু হিন্দু যাদের মন্তব্য এ রকম কোর্ট মন্দির বানানোর নির্দেশ দিক বা না দিক অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের স্হলে রাম মন্দির নির্মিত হবে এবং এও বলল যে এখানে মন্দির হবে না তো জিন্নাহ্ পারভেজ মোশারফের দেশ পাকিস্তানে মন্দির নির্মিত হবে? আর ভারতীয় মুসলমানেরা ভাল করবে যদি ভালোয় ভালোয় রাম মন্দিরের নির্মাণ মেনে নেয় নতুবা তারা ভালভাবেই জানে যে পরিণতি কেমন হয়। আমি এদের(১-৫ বিষয়গুলির মন্তব্যকারীরা নয়) কথা আর কি বা বলব কারণ যেখানে অসভ্য-বর্বর, কসাই, পিশাচ-দানব নরেন্দ্র মোদী বহাল তবীয়তে বুক ফুলিয়ে ভারতে রাজনীতি করে এবং শিবসেনা নেতা ব্যাল থ্যাকার বলেন যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর উচিত কাশ্মীরী মুসলমান মহিলাদের ধর্ষণ করা। কয়েকদিন আগে এই কুখ্যাত নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকার ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় উগ্রপন্হী হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন ও তার দল বিজেপি তো বটেই বরং কংগ্রেস সহ পার্লামেন্টের সকল দল এর প্রতিবাদ জানায়। উগ্রবাদী সংগঠনগুলো ভারতের কয়েকটি স্হানে বিভিন্ন মার্কিন শিল্প কারখানায় ও তার পণ্যে আগুন ধরায়। আশা করি পাঠকগণ বুঝতে পারছেন যে সকল সাধারণ হিন্দু দর্শক ১-৫ মন্তব্য করেছে আসলে তাদের ৯৯% ই চায় সেখানে রাম মন্দির নির্মিত হৌক, স্রেফ তারা ধর্মনিরপেক্ষতার ও গণতন্ত্রের ভন্ডামি করলো কারণ তারা ভাল ভাবেই জানে যে সেখানে আসলে কোনই মন্দির কোন কালেই ছিল না এবং এই বলার সৎ সাহস টা তাদের নাই যে সেখানে মসজিদ পুনঃ নির্মাণ করাটাই সত্যিকারের সুবিচার। ভারতে যতদিন বিজেপি ও তার উগ্রবাদী সহযোগী সংগঠনগুলো সরকারে ছিল তখন কংগ্রেস, বামদল সহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলো বিজেপি সরকারের কোন অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতেই প্রতিবাদ-সংগ্রাম, জনমত সংগঠন ইত্যাদি গণতান্ত্রিক কর্মপন্হা অবলম্বন করেছে। বিজেপি সরকারের আমলে কংগ্রেস কোনদিন কোন ইস্যুতে এমন কি ২০০২ সালের গুজরাট ম্যাসাকারের ঘটনাতেও বিদেশী কোন দেশের বা কোন আন্তজার্তিক সংস্হার কাছে কোন নালিশ জানায় নি। অথচ আওয়ামিলীগাররা ২০০১ সালের অনুষ্ঠিত অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হওয়ার পর

থেকে আজ পর্যন্ত জোট সরকারের বিরূদ্ধে অসংখ্য মিথ্যা অভিযোগ রটিয়েছে বা প্রোপাগান্ডা করেছে। তাদের অন্যতম অভিযোগ জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নাকি রাজনৈতিক কারণে সংখ্যালুঘূ বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের হত্যা, মহিলাদের ধর্ষণ, সম্পত্তি লুটপাট, বসত উচেছদ, তারা গণহারে নাকি দেশত্যাগে বাধ্য করছে। এ সরকারের আমলে স্রেফ চট্টগ্রামের বাঁশখালীর ১১ জন হিন্দু পরিবারের মানুষকে পুড়িয়ে মারার ঘটনাটাই হল সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। কিন্তু এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর ২/১ মাসে বিচিছন্ন কিছূ ঘটনায় মাত্র কয়েকজন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন অপরাজনীতির শিকার হন। আওয়ামিলীগের দ্বাবী যে এটা নাকি বিএনপির কাজ পক্ষান্তরে বিএনপির বা জোট সরকারের মতে এটা আওয়ামিলীগ নির্বাচনে পরাজিত হয়ে আন্দোলনের ইস্যূ বা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের প্রচেষ্টায় এ ধরণের কাজ করেছে। যাই হৌক যে সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এহেন নির্যাতনের শিকার তাদের প্রতি আমার সহমর্মিতা আছে এবং যারা এই জঘন্য অন্যায় করেছে তাদের আমি সবসময় ধিক্কার জানাই। কিন্তু যেভাবে ম্যাগনিফাইং করে তিল কে তাল বানানো হয় যাতে অল্প সংখ্যক ঘটনা কে দেশব্যাপী হিন্দু নিধন বা ম্যাসাকার হচেছ বলে আওয়ামিলীগার-বাকশালী ও তাদের তাবেদারজীবি এবং আওয়ামি পন্হী মিডিয়ারা ত্রাহি ত্রাহি ও বিদেশে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জার্তিক সংস্হার কাছে জোট সরকারের কাছে নালিশ ও বদনাম করতে থাকে। কিন্তু এ একটা চরম ট্র্যাজেডি ঘটনা যে জোট সরকারের ক্ষমতা নেওয়ার ৩/৪ মাসের মধ্যে অর্থাৎ ২০০২ সালে গুজরাটে মুসলিম নিধণজজ্ঞ চলে। ফলে গুজরাটের নারকীয় ঘটনা যে সারা বিশ্বের বিবেকের কাছে প্রচন্ড নারা দেয় এবং এর দ্বারা আওয়ামিলীগের জোট সরকারের বিরূদ্ধে তাদের কথিত সংখ্যা লুঘূ নির্যাতনের প্রোপাগান্ডা অনেকটাই চুপসে যায়। (চলবে)

**মোঃ মোস্তফা কামাল,**
ঢাকা, ৬-৫-২০০৫ ইং।